রাষ্ট্র কি শুধু শিক্ষকদের বেলায় এসে দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে?

সাব্রী সাবেরীন, সৌরভ জাকারিয়া এবং অরিয়ন তালুকদার

: বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫

একটি জাতি গঠনের মূল কারিগর হলেন শিক্ষক। শিক্ষকরা শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ান না, তারা চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করেন; ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগিয়ে তোলেন। মানুষের ভেতর মানুষ গড়ে তোলার যে পবিত্র সাধনা, তার অনন্য বাহক হলেন শিক্ষক। তাই বলা হয়, একজন শিক্ষক হাজার সৈন্যের চেয়েও শক্তিশালী, কারণ তিনি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করেন।

অথচ আজ এ প্রশ্নটিই বারবার কানে বাজে-রাষ্ট্র কি সত্যিই দরিদ্র? অন্য পেশার তুলনায় শিক্ষকদের বেতন, সুযোগ-সুবিধা, সম্মান-সবকিছুতেই বৈষম্যের ভারী ছায়া। রাষ্ট্রের নানা খাতে প্রাচুর্যের প্রদর্শনী থাকলেও শিক্ষকদের প্রসঙ্গ এলেই যেন রাষ্ট্র হঠাৎ ‘গরিব’ হয়ে পড়ে। গত নির্বাচনের সময় জনপ্রশাসন সচিব ২৬১টি নতুন এসইউভি মডেলের (মিতসুবিশি পাজেরো স্পোর্টস কিউ এক্স) গাড়ি কেনার প্রস্তাব করেছেন জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য। এই প্রস্তাবিত গাড়িগুলোর সিসি ২৪৭৭, এবং প্রতিটির দাম অন্তত অর্ধকোটি টাকার কাছাকাছি।

একই প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে এবারের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। অথচ অতীতের ন্যায় দেশে ডলার-সংকট, মূল্যস্ফীতি চরমে, সরকার বিদ্যুৎ ও সারের জন্য নগদ অর্থ দিতে না পেরে বন্ড ছাড়তে হচ্ছে । গ্যাস ও বিদ্যুৎ আমদানির অর্থও বকেয়া থাকছে। রাষ্ট্র যখন মন্ত্রী-সচিবদের জন্য বিলাসবহুল গাড়ি বরাদ্দ করে, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করে, তখন কোনো বাজেট সমস্যা হয় না। যখন প্রজাতন্ত্রের অন্য সব ক্যাডারের কর্মকর্তা একাধিক পদোন্নতি পান, বাড়তি বেতন-ভাতা কিংবা বিদেশ সফরের সুযোগ পান, তখন রাষ্ট্র থাকে উদার। কিন্তু রাষ্ট্র যেন হঠাৎ নিঃস্ব হয়ে পড়ে শুধুমাত্র শিক্ষকদের জন্য। পদোন্নতির বাজেট থাকে না, শিখন উপকরণের যোগান নেই, গৃহঋণের বরাদ্দ অপ্রতুল, প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকে না, উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের সীমিত সুযোগও কেড়ে নেওয়া হয়, মর্যাদার ন্যূনতম স্বীকৃতিও নীতিবাক্যে সীমাবদ্ধ!

আসুন এবার ব্যাংক খাতের দিকে তাকাই। সোনালী ব্যাংকে রয়েছে প্রায় ১৮,১৬৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনতায় ১৪,৩২৩ জন এবং অগ্রণী ব্যাংকে ১০,৬৭৭ জন। এসব প্রতিষ্ঠানে বছরে ৫টি বোনাস (৩টি ইনসেন্টিভ এবং ২টি উৎসবভাতা), প্রতিদিন দুপুরে ৪০০ টাকা লাঞ্চ ভাতা, গৃহঋণ, গাড়ি ক্রয় সুবিধা এবং অন্যান্য নানা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা মিলছে। প্রশ্ন হলো, এই বিশাল ব্যয় যদি ব্যাংকগুলো বহন করতে পারে তবে সেই একই রাষ্ট্র স্নাতকোত্তর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ব্যয় করতে পারে না কেন? শিক্ষক-কর্মকর্তাদের সময়মতো পদোন্নতি, গ্রেড ও মর্যাদা প্রদান করতে পারে না কেন?

রাষ্ট্র কি কেবল শিক্ষকদের বেলায় এসে দরিদ্র হয়ে যায়? অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি খাতে কাজ করেও শিক্ষকদের অবস্থান যেন দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মতো। পদোন্নতি নেই, প্রণোদনা নেই, যাতায়াতের জন্য যানবাহন নেই, লাঞ্চ ভাতা নেই, স্বীকৃতি নেই-আছে শুধু দায়িত্ব আর অবহেলা।

এই বৈষম্য কেন? এ দেশে শিক্ষককে বলা হয় জাতির মেরুদ-, অথচ সেই মেরুদন্ড প্রতিনিয়ত আঘাত আসে উপেক্ষার, অবহেলার, বঞ্চনার। যেন

রাষ্ট্রের চোখে শিক্ষক শুধু দায়সারা কাজ করা এক শ্রেণির মানুষ, যাদের কোনো চাওয়া-পাওয়া, উন্নয়ন কিংবা মর্যাদার অধিকার থাকতে নেই। রাষ্ট্র কি ভুলে যাচ্ছে- এই শিক্ষকই একজন বিচারপতির ন্যায়বোধ গড়েন, একজন সেনা কর্মকর্তার শৃঙ্খলাবোধ তৈরি করেন, একজন সচিবের বিবেচনাবোধ গড়ে দেন, এমনকি একজন মন্ত্রীর ভাষার কাঠামো তৈরি করেন?

?তবু শিক্ষক থাকেন অবহেলিত, নীরবে কর্তব্যরত। অতএব হ্যাঁ, প্রশ্নটা আজ অনিবার্য হয়ে উঠেছে-রাষ্ট্র কি কেবল শিক্ষকের বেলায় এসে দরিদ্র হয়ে যায়? না হলে কেন যে প্রাথমিক শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের মূল ভিত নির্মাণ করেন, তারা এখনও রাষ্ট্রের ৩য় শ্রেণির চাকুরে? দীর্ঘদিন ১৪তম ও ১৩তম গ্রেডে চাকরি করার পর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এখনও তারা ১২তম গ্রেডে চাকরি করছেন, ১১তম গ্রেড নির্ধারণের জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে তাদের। প্রধান শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড পেতে শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে, তাও শতভাগ প্রধান শিক্ষকের ১০ম গ্রেড প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়নি এখনও।

এত অপ্রাপ্তির সাথে আছে পদোন্নতি না পাওয়া। বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ২৫-৩০ বছর চাকরি করেও কোনো পদোন্নতি পান না। অল্প কিছু সংখ্যক প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পেলেও সেটা পুরো চাকরিজীবনে একটা মাত্র পদোন্নতি! যেখানে রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মচারীরা পুরো চাকরিজীবনে ৩/৪/৫টি পদোন্নতি পান, সেখানে জাতি গড়ার প্রধান কারিগররা ১টি বা পদোন্নতিশূন্যতা নিয়ে অবসরে যান! গত সেপ্টেম্বরেও ১৪তম গ্রেডের সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদ থেকে সরাসরি ৯ম গ্রেডের উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার পদে পিএসসি পদোন্নতির সুপারিশ করেছে। উচ্চমান সহকারী প্রমোশন পেয়ে হয় দ্বিতীয় সচিব (৯ম গ্রেড), ড্রাইভার প্রমোশন পেয়ে হয় উপসহকারী প্রকৌশলী-কিন্তু জনমদুঃখী প্রাথমিকের শিক্ষকগণ গ্রেড-৯ গিয়ে চাকরি শেষ করতে পারেন না, তাদের ১ম শ্রেণির চাকুরে বানিয়ে অবসরে পাঠানোর উদারতাটুকুও রাষ্ট্রের কাছে দেখা যায় না!

এর বাইরে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের মানবেতর জীবন রাষ্ট্রের কর্ণকুহরেও পৌঁছে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব তাদের কাঁধে। অথচ দায়িত্বের ভারে ন্যুব্জ এই পেশাজীবীদের জীবন-জীবিকা নিয়ে রাষ্ট্রের যে চিত্র, তা কোনোভাবেই কাক্সিক্ষত নয়। বেসরকারি স্কুল-কলেজের একজন সহকারী শিক্ষক যে বেতন পান, তা দিয়ে একটি পরিবারের ন্যূনতম অভাব মেটানোই দুষ্কর। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে প্রায়ই দেখা যায় দ্বৈত চাকরি করে, কিংবা কৃষিকাজ করে সংসার চালাতে। এ কি তাদের অক্ষমতা, নাকি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতা?

মাধ্যমিক স্তর হলো শিক্ষাজীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এখানে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নিজেদের জ্ঞান, চরিত্র ও জীবনদর্শন গড়ে তোলে। এই প্রক্রিয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের অবদান অনন্য। অথচ সেই মাধ্যমিক শিক্ষকগণ ১০ম গ্রেডে চাকরি শুরু করে ৯ম গ্রেডে পদোন্নতি পেতে যুগ পার করতে হয়। খুব অল্প সংখ্যক সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সহকারী প্রধান বা প্রধান শিক্ষক হতে পারেন! তাদের মধ্যে যারা খুব সৌভাগ্যবান, তারা হয়তো ৪র্থ গ্রেড পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন ৩০ -৩২ বছর চাকরি করেও! শহরের অধিকাংশ এমপিওভুক্ত কলেজের শিক্ষকরা বিশেষ করে বিভিন্ন বাহিনী পরিচালিত কলেজের শিক্ষকরা (৪০-৫৫)% বাড়ি ভাড়া ভাতার সাথে অতিরিক্ত (১০-৩০)% সিটি অ্যালাউন্স বা অন্যান্য ভাতা পেলেও জেলা-উপজেলা পর্যায়ের সরকারি বা এমপিওভুক্ত কলেজের শিক্ষকরাই অনেকটাই বঞ্চিত। এখনও তারা মূল বেতনের মাত্র ২০% বাড়ি ভাতার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, আশ্বাস ও দীর্ঘসূত্রিতার ঘেরাটোপে যা আজও বন্দী। বর্তমানে তারা মাত্র ১০০০ টাকা বাড়ি ভাড়া ভাতা ও ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা পান!

সরকারি কলেজ শিক্ষক তথা বিসিএস সাধারণ ক্যাডারের শিক্ষকরাও অন্য ক্যাডারের তুলনায় পাহাড়সম বঞ্চনার শিকার। পদোন্নতি যোগ্য প্রভাষকগণ এক যুগের বেশি সময় ধরে প্রভাষক, পদোন্নতির দাবিতে ব্যানার হাতে নিয়মিত রাজপথে দাঁড়াতে হচ্ছে। ৩৭ ব্যাচ পর্যন্ত সকলেই পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করে কর্মজীবনের সপ্তম বছরে পদার্পণ

করেছেন, অথচ অন্যান্য ক্যাডারের ৩৭তম ব্যাচের কর্মকর্তারা পদোন্নতি পেয়েছেন ২০২৪ সালেই। বিপ্লবের পরে কোন কোন ক্যাডারে একই টায়ারে একাধিকবার পদোন্নতি হয়েছে, কারো এপিটাফে লেখা হয়েছে গ্রেড ওয়ান, আর শিক্ষা ক্যাডারের প্রভাষকদের ৭-১২ বছর পদোন্নতিশূন্যতায় জীবন জেরবার। একই চিত্র সহকারী অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকের ক্ষেত্রেও। অন্তত ৪০০০ সহকারী অধ্যাপক পদোন্নতিযোগ্য হলেও ১২ -১৭ বছরে তারা একটিমাত্র পদোন্নতি নিয়ে তীর্থের কাকের মত চেয়ে অপেক্ষায় আছে সহযোগী অধ্যাপক হওয়ার। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ১২ বছরে অধ্যাপক হলেও শিক্ষা ক্যাডারের ২১ - ২৫ ব্যাচ ২০ -২২ বছর চাকরি করেও অধ্যাপক হতে পারেননি। আর শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকদের বেতন স্কেলের ১ম গ্রেডে পৌঁছানো যেন স্বপ্ন! ২০০৯ সালের বেতন স্কেলে যাও অধ্যাপকদের ৫০% ৩য় গ্রেড লাভ করার সুযোগ ছিল, ২০১৫ সালের বেতন স্কেল সে পথও রুদ্ধ করা হয়। অথচ অভিন্ন সিলেবাস, অভিন্ন প্রশ্নপত্র ও জাতীয় ভিত্তিক তীব্র প্রতিযোগিতামূলক অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োগ পেলেও বিশেষ কয়েকটি ক্যাডারের জন্য গ্রেড-১ সুবিধা অবারিত। দেশের ৫৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ হাজার ৮০৫ জন শিক্ষকের প্রত্যেকের কর্মজীবনে গ্রেড-১ ওয়ানে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকসহ সিভিল এডুকেশনের সকল শিক্ষক গ্রেড-১, ২, ৩ পাওয়ার সুযোগ বঞ্চিত।

শিক্ষকদের মধ্যে পদোন্নতির দিক দিয়ে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও নানা বৈষম্য আর সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখনও গাড়ি সুবিধা বঞ্চিত, অথচ তাদের চেয়ে নিম্ন বেতন গ্রেডের ৫ম থেকে ১ম গ্রেডের উপসচিব ও তদূর্ধ্বগণ গাড়ি সুবিধা থেকে বাবুর্চি সুবিধা পর্যন্ত পান! এমনকি ব্যাংকের কর্মকর্তারাও গাড়ির সুবিধা উপভোগ করছেন। শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ান, লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে সে। অথচ যিনি লেখাপড়া করান, তার ভাগ্যে গাড়ি-ঘোড়া জোটে না! অর্জিত ছুটি সহ বিভিন্ন প্রাপ্য সুবিধার ক্ষেত্রেও শিক্ষকরা বৈষম্যের শিকার হন। রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মচারীর সাথে শিক্ষকদের বার্ষিক ছুটির খুব বেশী পার্থক্য না থাকলেও শিক্ষকদের চাকরি অবকাশ বিভাগের। অথচ শিক্ষকগণ বিভিন্ন জাতীয় দিবসেও ছুটি ভোগ করতে

পারেন না, দিবস পালন সংক্রান্ত সরকারি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকার কারণে। জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণ অবকাশ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত এবং তাদের জন্য জুডিশিয়াল ভাতা থাকলেও অবকাশ বিভাগের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা ভাতা রাখার উদারতা রাষ্ট্র দেখাতে পারেনি।

রাষ্ট্র যে শিক্ষকদের বেতন বা আর্থিক সুবিধার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করছে তা নয়, দায়িত্ব ও মর্যাদার প্রশ্নেও রাষ্ট্র শিক্ষকদের নিম্নতর অবস্থানে রেখে যেন স্বস্তি পায়। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রম বা "ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স"-এর ১৯ তম অবস্থানে আছেন জাতীয় অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অধ্যাপকগণ। অথচ একই বেতন গ্রেডভূক্ত সরকারের সচিবদের অবস্থান ১৬ তম অবস্থানে। শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দপ্তরে শিক্ষকদের নিয়োগ-পদায়ন সুবিধাও সীমীত করে ফেলা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এর পদগুলো বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের পদ হলেও সেসব দপ্তরের পদগুলোতে অশিক্ষকদের নিয়োগ-পদায়ন হচ্ছে। অথচ মাঠ পর্যায়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা শিক্ষার প্রশাসনিক দপ্তরগুলোতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা সহজ হত।

শিক্ষা সংক্রান্ত দপ্তরগুলোতে শিক্ষা সার্ভিসবহির্ভূতদের নিয়োগ দেয়ার ফলে শিক্ষার মানেরও অবনমন হয়েছে সর্বক্ষেত্রে। এদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে মাধ্যমিককে আলাদা করে সেখানেও অশিক্ষকদের পদায়ন করার প্রক্রিয়া চলছে। উপানুষ্ঠানিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরগুলো শিক্ষকদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়ার পর থেকেই এ ক্ষেত্রগুলোর মান ক্রমাগত অবনমন শুরু হয়েছে। জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, যে প্রতিষ্ঠানগুলো একসময় স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধির প্রধান ভরসা ছিল, আজ আর তারা আগের মতো শিক্ষার প্রসারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা তার পূর্বের গৌরব হারিয়েছে, আর প্রাথমিক শিক্ষকদের হাতছাড়া হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষার মানও দৃশ্যমানভাবে কমে গেছে। তবুও বিসিএস সাধারণ শিক্ষার স্বার্থ উপেক্ষা করে এ খাতকে শিক্ষকশূন্য করার নানা উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে বলতে হয়-"বন্যেরা বনে সুন্দর,

শিশুরা মাতৃক্রোড়ে- শিক্ষাও কেবল তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা শিক্ষকের হাতেই থাকে।

শিক্ষকদের ব্যাপারে কেন রাষ্ট্রের এই ঔদাসীন্য কিংবা নিস্পৃহতা? কারণ রাষ্ট্র জানে, শিক্ষক কখনো রাজপথে গাড়ি পোড়াবেন না, রাষ্ট্রের টনক নড়ে যাওয়ার মতো শোরগোল তারা করতে পারবেন না। হয়তো রাজপথের কোনো এক অন্ধ গলিতে মাইক্রোফোন হাতে ক্ষীণকণ্ঠে বৈষম্য-বঞ্চনা নিরসন কিংবা দাবি পূরণের কাকুতি-মিনতি করবেন। তারপর আবার ফিরে যাবেন শ্রেণিকক্ষে-নীরব থেকে, নিভৃতে সাদা খাতার মতো নিঃশব্দ থেকে, মনের অগ্নিশিখা দিয়ে জাতিকে জ্বালিয়ে যাবেন। তাই হয়তো রাষ্ট্র সাহস করে শিক্ষকের বেলায় দরিদ্র হয়ে পড়ে। কিন্তু এভাবে কী চলতে পারে? একটি দেশ তখনই এগিয়ে যায় যখন তার শিক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী হয়। আর শক্তিশালী শিক্ষাব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হলেন একজন যোগ্য, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও আর্থিকভাবে সচ্ছল শিক্ষক। শিক্ষক যদি নিজের জীবন নিয়েই এতা ব্যস্ত থাকেন যে শিক্ষাদানে তার পুরো শক্তি ও মনন নিবেশ করতে পারেন না, তাহলে জাতির ভিত কীভাবে শক্ত হবে?

অতএব, আমাদের সচেতন হতে হবে শিক্ষকদের অধিকার ও সম্মানের প্রশ্নে। রাষ্ট্রকে এ প্রশ্নটি জোর গলায় করতে হবে- শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কি জাতীয় বেতন কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে কি না, এবং তার সঠিক বন্টন নিশ্চিত করা হচ্ছে কি না? শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও কর্মপরিবেশের উন্নয়নের জন্য কী কী পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে? রাষ্ট্রের কোষাগার শিক্ষকদের জন্য কখনোই অপ্রতুল হওয়ার কথা নয়। বরং, শিক্ষকদের জন্য বিনিয়োগই হলো দেশের ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে লাভজনক বিনিয়োগ। শিক্ষকরা যদি সচ্ছল ও সম্মানিত হন, তাহলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে তুলবেন একটি জ্ঞানভিত্তিক, নৈতিকতাসম্পন্ন ও উন্নত জাতি। সেদিনই শিক্ষক দিবসের প্রকৃত শ্রদ্ধা ও অঙ্গীকার পূরণ হবে।

(মতামত লেখকদের নিজস্ব)

[লেখকবৃন্দ: শিক্ষক ও সদস্য, দি এডভাইজরস: থিংক ট্যাংক অব সিভিল এডুকেশন]